স্বপ্ন ও দীর্ঘশ্বাসের গল্প

শোয়ায়েব চমক

হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে সোহেল যখন বের হল তখন বিকেল ৪টা পেরিয়েছে। প্রথমবার প্লেন এ ওঠার উত্তেজনায় বুঝতেই পারেনি যে দুবাই হয়ে ঢাকা টু লন্ডন এর কতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। পড়াশোনা করতে সে লন্ডন যাচ্ছে, ভিসা পাওয়ার পর থেকে ওর মাথা খারাপ হবার দশা। কত কিছু সামলে যে এই পর্যন্ত আসতে হল- প্লেন এ বসে বসে সোহেল সেটাই ভবছে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সোহেল। বাবা মা এর আর কীই বা আছে! তবুও যখন দেখল আশেপাশে ছেলেমেয়েরা বিদেশ গিয়ে পড়াশোনা করছে আার টাকা পয়সাও পাঠাচ্ছে তখন পরিবারের সবাই আর একটু ভাল থাকার আশায় বিদেশ যাবার ব্যাপারে সোহেলকে উৎসাহ দিল। এরপর শুরু হল যত দৌড়ঝাঁপ। লন্ডনের কলেজগুলোর ঢাকার এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা। টাকা পয়সা যোগাড় করা। ভিসার জন্য তারিখ নেয়া, ইত্যাদি কত কী!!! টাকা যোগাড় করাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। দিবো, দিচ্ছি, বলে কত আত্মীয় স্বজন কত জন যে ঘোরালেন। অনেক আত্মীয় তো 'বিদেশ যাবার খায়েস কেন হইল!' বলে চোখ কপালে তুললেন। 'ভিসা এত সস্তা' না বলে অনেকে আবার আগেভাগেই টাকা না দেওয়ার বিষয়টা পরিষ্কার করে দিলেন। তবু সোহেল হাল ছাড়লো না। শেষমেশ তার এই সফলতা। বাবাকে না জানিয়ে মা অবশ্য তাঁর একটা গয়না বিক্রি করে দিয়েছেন, বাবাও মাকে না জানিয়ে একটা সঞ্চয়পত্র বিক্রি করেছেন। সবই সোহেল জানে বন্ধুরা কিছু ধার দিল, আর দিলেন দুরসম্পর্কের এক খালু। যাঁর কাছ থেকে সোহেলে আশাই করেনি। ভিসা পাওয়ার পর আত্মীয়স্বজনরা বলতে লাগল, 'ভিসা মনে হয় আজকাল ইজি হয়ে গেছে, আগের মত কঠিন নাই।' বাবা মাকে এসে অনেকে বলতে লাগলেন, 'লন্ডন পাঠাইতাসেন, পোলা ফেরত আইব তো? বিয়া করায়া পাঠান, আবিয়ত্ত বিদেশ পাঠান ঠিক না।'

লন্ডনে যে কলেজে সোহেল পড়তে এসেছে ঢাকাতে তাদের এজেন্সি বলে দিয়েছিল যে কলেজের গাড়ি আসবে পিকআপ করার জন্য। এয়ারপোর্ট থেকে সোহেল দেখল Sohel from Bangladesh লেখা একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এক শিখ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। সোহেল ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। লিফট বেয়ে কার পার্কিং এ এসে শিখ সাহেব বললেন, 'ইয়াহা খাঁড়ে রহ, ম্যায় কার লেকে আতা হু।' সোহেল খুব অবাক, মজাও লাগল। ভেবেছিল কোন একটা ব্রিটিশ এর সাথে তার প্রথম দেখা হবে কিন্তু হল এক ইন্ডিয়ান-এর সাথে। এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনেও কোন ব্রিটিশ এর সাথে তার কথা হয়নি, হয়েছে এক আফ্রিকান -এর সাথে। সে অনেক উল্টে পাল্টে সোহেল এর পাসপোর্ট দেখল। হাতে লেখা পাসপোর্ট বিশ্বের অল্প কিছু দেশে ব্যবহার করে। পাসপোর্টের ছবির সাথে সোহেলের মিল আছে কিনা সেটা বারবার করে সে দেখল। ব্রিটেনে সোহেলের ঢোকার অধিকার আছে কি নাই এটা একটা ব্রিটিশ এর বদলে একজন আফ্রিকান পরীক্ষা করছে দেখে সোহেল খুবই অবাক হল। লন্ডন যে একটা মাল্টিকালচারাল সিটি এই জ্ঞান সে ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছে।

প্রায় আড়াই ঘন্টা ড্রাইভ করে ড্রাইভার পাপ্পাজি সোহেলকে নিয়ে এল ইস্ট লন্ডনে। রাত তখন ৮টা। ওয়ালথামাস্তও এলাকার বেকানস আর্মস নামের একটা জায়গায় এক বাসার সামনে গাড়ি থামিয়ে শিখ পাপ্পাজি বললেন, 'উতরো আভি, আ গয়্যা হাম।' নক করার পর সোহেলের বয়সী একজন দরজা খুলে দিলে পাপ্পাজি বললেন, 'ইয়ে হ্যায় তুমহারা হোস্টেল , আভি ৫০ পাউন্ড দো।' সোহেল অবাক হয়ে ইংরেজীতে বলল, 'হোয়াই?' পাপ্পাজি তখন বললেন, 'ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া কওন দেগা পাপ্পাজি?' যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে তখন বাংলাতেই বলল, 'দিয়ে দেন ভাই, দিতে হবে, কিছুই ফ্রী নাই।' ৫০ পাউন্ড নিয়ে পাপ্পাজি চলে গেলেন। সে সোহেলকে একটা রুমে নিয়ে গেল। পরিচয় দিল তার নাম আসলাম। সেও একই কলেজে পড়তে এসেছে। বাংলাদেশ থেকে। সে জানত যে সোহেল আসবে, কলেজ থেকে তাকে বলে দিয়েছে।

২

আসলাম লন্ডনে এসেছে দুই মাস। কিন্তু এখনও কোন চাকরি হয়নি। দেশে থাকতে সবাই বলেছিল, ব্যাপার না লন্ডন এ কত চাকরি আছে এয়ারপোর্টে নামলে দেখবি এজেন্সির লোকজনেরা খাড়ায়া আছে। সব মিথ্যে কথা। বাংলাদেশে বসে যারা এরকম কথা বলে তাদের বিদেশ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। যে কলেজে আসলাম এসেছে সেই কলেজেও আসলামের কল্পনার সাথে মেলেনি। লন্ডনের একটা কলেজ বলতে কল্পনার যে ছবি আছে তার সাথে এই কলেজের কোনও মিল নেই। তিন রুমের একটা কলেজ। একটা রুম অফিস, একটা লাইব্রেরী কাম কম্পিউটার ল্যাব, আর একটা রুমে ভাগে ভাগে ক্লাস হয়। ঢাকা শহরের একটা কোচিং সেন্টারও এর থেকে ভাল। কলেজের সবাই বাঙ্গালী। একদিন আসলাম ক্লাস করার জন্য অনেকক্ষণ বসে থাকার পর অফিস থেকে একজন বললেন, 'ভাইজান আপনে চলে যান ক্লাস আজকে হবে না, আর আপনার প্রতিদিন আসার দরকার নাই, আমরা ফোন করে জানায়া দেবো কবে ক্লাস হবে।' সেই থেকে আসলাম বাসায় বসে আছে। কলেজ থেকে ফোনও আসে না, ক্লাসও করা হয় না।

সকাল বেলা আসলাম এক গাদা সিভি প্রিন্ট করে বের হয়, সারা দিন ঘুরে ঘুরে চাকরির জন্য সিভি বিলি করে। বিকেলে বাসায় চলে আসে। রাতে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কলেজ থেকে যে বাসাটা দেয়া হয়েছে সেটা খুব একটা খারাপ না। ভাড়া একটু বেশি। সপ্তাহে ৭০ পাউন্ড করে নিচ্ছে। অনেকে বলছে ছেড়ে দিতে বাইরে নাকি এর থেকে অনেক

সস্তায় বাসা পাওয়া যায়। এদিকে দেশ থেকে আনা টাকাপয়সা শেষ হয়ে আসছে। নিয়মকানুনগুলো এখনও টিকমত জানা হয়ে না ওঠায় আসলাম বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। তাছাড়া তেমন কেউ পরিচিত নেই যে বুদ্ধিটুদ্ধি দিবে।

কলেজে অবশ্য একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে। শবনম নাম। বার্গার কিং নামের একটা ফাস্ট ফুড এর দোকানে কাজ করে। মেয়েটা বলেছে জবের ব্যাপারে হেল্প করতে চেষ্টা করবে। পত্রিকা বিলি করার একটা কাজ অবশ্য করা যায়। ভোর ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। মাত্র ৪ ঘন্টার জন্য এত ভোরে উঠে কাজ করতে যেতে আসলামের ইচ্ছে করছে না। তার উপর এত ভোরে উঠতে আসলেমি লাগে। কিন্তু আর কিছু না পেলে হয়ত আসলাম এই জবটাই শুরু করবে। এখন আজও একজন পাওয়া গেছে, যাকে নিয়েও জব খুঁজতে বের হওয়া যায়। সোহেল ছেলেটাকে তার ভালই লেগেছে, পত্রিকা বিলির কাজটাও দুইজন মিলে করা যেতে পারে।

৩

শবনম আখতার মৌসুমী লন্ডনে এসেছে ৬ মাস হল। অবশ্য সে ইউকে থেকে এসেছে বছর দেড়েক আগেই। প্রথমে সে এসেছিল ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস এ। পদার্থবিদ্যার ওপর পড়ার জন্য। বেশ কিছু ফীস দেওয়া হয়েছিল। মাস্টার্স করার আগে তাকে একটা প্রি মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে হয়েছে। ৬ মাসের সেই কোর্সে পুরনো অনেক কিছুই শবনমকে নতুন করে পড়তে হয়েছে। কিছুই করার ছিল না, ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটিগুলো বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর এডুকেশনকে গোনায় ধরে না। তাই এই ছয় মাসে অতিরিক্ত পড়াশোনা। এই ৬ মাসেই শবনমের যা টাকা ছিল মোটামুটি প্রায় শেষ হয়ে গেলো। ইউনিভার্সিটির হাই টিউশন ফী, সেই সাথে ইউনিভার্সিটির হোস্টেলের খরচ এবং চাকরি বাকরি ছাড়া চলাফেরা তার সঞ্চয় শেষ করে ফেলেছে। প্রি মাস্টার্স শেষ করার পর যখন মূল কোর্স শুরু হবে তখন শবনমের কাছে টিউশন ফী দেবার মত আর টাকা নেই। অনেকেই তখন বুদ্ধি দিল, যেহেতু ৩ বছরের ভিসা আছে আপনি বরং এ বছর পড়াশোনা বাদ দেন। চাকরি কইরা টাকা জামান, তারপর আবার কোর্স শুরু করেন। চাকরির জন্য বেস্ট হচ্ছে লন্ডন। শবনম ওয়েলস থেকে লন্ডনে চলে আসলো।

মেয়েমানুষের শুভাকাঙ্খীর অভাব হয় না। শবনমের লন্ডনে তেমন কোনও অসুবিধা হয় নি। পরিচিত একজনের রেফারেন্সে কম খরচে একটা রুম ভাড়া পাওয়া গেছে, আর একজনের বদৌলতে বার্গার কিং-এ কাজও জুটে গেছে। লন্ডনের একটা কলেজে মাত্র ৫০০ পাউন্ডের বিনিময়ে ১ বছরের ডন্য স্টুডেন্ট পেপার রেডি হয়ে গেছে, যদিও শবনম মাত্র ৩০০ পাউন্ড দিয়েছে বাকি ২০০ পাউন্ড মনে হয় না দিলেও চলবে।

বার্গার কিম এ বেশ ভালই লাগে শবনমের। বেশির ভাগই এশিয়ান। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা মিলিয়ে মোটামুটি সার্ক সম্মেলন চলে। কিছু মরিশাস এবং আফ্রিকানও আছে। সবার সাথে বেশ মজা করেই কাজ করা যাচ্ছে। ওয়েলসের চুপচাপ পরিবেশ থেকে লন্ডনের সর্বক্ষণ ব্যস্ত জীবনযাপন বেশ উপভোগ করে শবনম। সোহেলের আজকে একটা জব উন্টারভিউ আছে। একটা স্যান্ডইউচ ফ্যাক্টারিতে। দীর্ঘ আড়াই মাস পর একটা শক্ত রেফারেন্সে পাওয়া ইন্টারভিউ এর ডাক। এই আড়াই মাসে মোটামুটি বেশ ভালই অভিজ্ঞতা হয়েছে সোহেলের। কীভাবে জব আপ্লিকেশন করতে হবে, কীভাবে জব চাইতে হবে, কীভাবে ইন্টারভিউ-এর জবাব দিতে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চাকরিটার খোঁজ দিয়েছে এক ছেলে। গত সপ্তাহে বাসে করে আসলাম ফিরছিল, সেসময় দুজন মিলে চাকরি আকাল নিয়ে আলোচনা করছিল। ইউনাইটেড কিংডম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে স্বাগত জানাবার পর থেকে যে পরিমাণ ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান এ দেশে এসেছে, তাতে নন ইউরোপিয়ানদের চাকরি পাওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে। ইস্টার্ন ইউরোপিয়ানগুলো ইউকের মিনিমাম বেতনের তোয়াক্কা না করে তার থেকে অনেক কম বেতনে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়। এদের কারণে নন ইউরোপিয়ান হিসেবে এশিয়ানরা তো বটেই খোদ ব্রিটিশরা পর্যন্ত ডবলেস হয়ে গেছে। বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এর অন্যতম ভুক্তভোগী। এইসব নিয়েই যখন সোহেল আর আসলাম কথা বলছিল তখন পেছনে সিট থেকে এক বাংলাদেশি ছেলে বলল, 'আপনারা কি চাকরি খুঁজছেন নাকি?' সোহেল ও আসলাম মাথা নাড়তেই সে বলল, 'এক জায়গায় চাকরি আছে কিন্তু আপনারা পারবেন কিনা। অনেক ঠান্ডা ওখানে।' সোহেল অবাক হয়ে বলল, 'মানে?' ওটা একটা স্ট্যান্ডউইচ তৈরির কারখানা, টেম্পারেচার সবসময় মাইনাস ফাইভে থাকে। বিশাল একটা ফ্রিজের মধ্যে কাজ করতে হবে। পারবেন?' আসলাম কিছু বলার আগেই সোহেল বলল 'পারব'। ছেলেটি তখন ঐ ফ্যাক্টারির ফোন নাম্বার দিয়ে বলল আমার নাম বলবেন, বলবেন, 'এখানে জব করে সুলতান। তার কাছ থেকে খোঁজ পাইছেন।' সোহেল ফোন করে ইন্টারভিউ এর সময় নিয়েছে। বাসা থেকে অনেকটা দূর, প্রায় ৫০ মিনিটের ট্রেন। কিন্তু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। দেশ থেকে যা নিয়ে এসেছিলো তার প্রায় সবই শেষ। বাসা চেইঞ্জ করে একটা সস্তা বাসা নিতে হয়েছে। আসলামও তার সাথে চলে এসেছে। ৭০ পাউন্ড প্রতি সপ্তায় দেবার মত সামর্থ্য তাদের কারোর নেই। দুইজন মিলে এখন ৫০ পাউন্ডে একটা ছোট রুম ভাড়া করেছে। ভাগে ২৫ পাউন্ড করে পড়েছে দুজনের। অনেক সস্তা !!! ইন্টারভিউটা তেমন কোন জটিল কিছু ছিলনা। রাশিয়ান এক মহিলা শুধু বলল, work for an hess s eeyou like it or nos আসলে এই জবটা তেমন কেউ করতে চায় না। কারণ এর পরিবেশ। কে চায় ৮ থেকে ১২ ঘন্টা একটা ফ্রীজ এর মধ্য থেকে কাজ করতে। সোহেল জবটা নিল। ঘন্টা ৫ পাউন্ড। খারাপ না আপাতত। তবে পরে বাড়বে। কিছু বাঙ্গালী আছে তার মধ্যে একজন সেই সুলতান। যার কারণে এই জবটা পাওয়া। বাকি সবই ইউরোপিয়ান।

আসলামেরও চাকরি হয়েছে বার্গার কিং এ। শবনম ব্যবস্থা করেছে। শবনমের সাথে কিছু একটা আসলামের হয়েছে বলেও ধারণা সোহেলের। এক সাথে শিফট করে, শবনমকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফেরে।

৫

লিটন সাহেবের বয়স ৩৮। ২৫ বছর বয়সে তিনি দেশ ছাড়েন। প্রথমে গিয়েছিলেন জার্মাণীতে। নাট্যকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে। পঁচিশ বছরের যৌবনের উত্তেজনায় পড়াশোনার বদলে বরং জীবনটাকে উপভোগ করার দিকেই মনোযোগ ছিল বেশি। তাই অচিরেই জার্মানীর পাট চোকাতে হয়েছে। কিন্তু ইউরোপে থাকার মজা পেয়ে গেছেন তিনি, দেশে ফিরে গিয়ে কী করবেন? এই ভেবে চলে এলেন লন্ডন। স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে। ইউনিভার্সিটি অব এসেক্স-এ থিয়েটার নিয়ে পড়তে। কিন্তু বললেই কি পড়া যায়? টাকা তো থাকতে হবে। তাই লিটন সাহেব ইউনিভার্সিটি অব এসেক্স-এ থিয়েটার নিয় পড়তে। কিন্তু বললেই কি পড়া যায়? টাকা তো থাকতে হবে। তাই লিটন সাহেব ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে এলেন ইস্ট লন্ডনের একটা ছোটখাট কলেজে। অল্প কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ভিসার কাগজপত্র ঠিক রাখলেন। ৪ বছরের ভিসা থাকায় নিশ্চিন্তে চেলে গেলেন রেস্টুরেন্টের ওয়েটার এর কাজ করতে। প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করেন। থাকা খাওয়া রেস্টুরেন্ট এর উপরেই। সপ্তাহ শেষে ২৫০ পাউন্ড ক্যাশ। মাসে ১০০০ পাউন্ড। মোটামুটি পুরোটাই সেভিংস। সপ্তাহে একদিন ছুটি। সেইদিন শুধু ঘুম। আরামেই ছিল। রেস্টুরেন্টটা ছিল লন্ডনের বাইরে অন্য একটা শহরে। একদিন পুলিশের রেইড পড়ল। পুলিশ প্রশ্ন করল তুমি থাক লন্ডনের বাইরে, কাজ কর লন্ডনের বাইরে। অথচ বলছ তোমার কলেজ লন্ডনে, এটা কী করে সম্ভব? অনেক নিথ্যে কথা বলে লিটন সাহেব সেবার পার পেয়ে গেলেন। পুলিশ যাবার সময় বলে দিল if you want to save yourself, move in to London, we understand everything.. লিটন সাহেব লন্ডন চলে এলেন। ৩০ বছর বয়সে ইউকোতে এসেছিলেন, এখন তার বয়স ৩৮। ৮ বছর পার হয়ে গেলো। এর মধ্যে ৩ বার ভিসা বাড়িয়েছেন। স্টুডেন্ট হিসাবেই। ২ বার দেশে গিয়েছেন। বউ নিয়ে এসেছেন। এখন জামাই বউ দুজন মিলেই কাজ করে যাচ্ছেন। বাচ্চা কাচ্চা এখনও নেননি। আর একটু সামলে নিই করতে করতে টাইম চলে যাচ্ছে। বয়সও প্রায় ৪০ হতে চলল। বিয়ের বয়স হল ৫ বছর। আজ লিটন সাহেবের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী। তেমন একটা মানুষজনের সাথে লিটন সাহেবের চলাফেরা নাই। অল্প কিছু পরিচিত মানুষের সাথে আসলাম, সোহেল আর শবনমকেও উনি দাওয়াত দিয়েছেন। ছোট্ট ঘরোয়া আয়োজন।

বিকেল থেকেই সবাই আসতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে আড্ডা জমে উঠেছে। উইক ডে হওয়াতে সবাই একটা দেরি করেই আসবে। রাত ৯টার মধ্যে পার্টি জমে গেল। খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সবাই যে যার মত নিয়ে খাচ্ছে। এখানে নিয়ম হল কোথাও কেউ দাওয়াত দিলে সবাই একটা ডিশ রান্না করে নিয়ে এসেছে, সোহেল এনেছে ডিম ভুনা আর আসলাম রান্না তেমন জানে না, সে নিয়ে এসেছে সফট ড্রিংক্স, অনেকে আার হার্ড ড্রিংক্সও এনেছে।

খাবার দাবার পর্ব শেষ হবার পর বসল আড্ডার পর্ব। কেউ হুইস্কি, কেউ ভদকা, কেউ বা ওয়াইন অথবা শুধু বিয়ার। অনেকে ওনলি সফট ড্রিংক্স। একজন বাচ্চা নিয়ে এসেছেন। তাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন।

আড্ডার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে চলে আসে স্টুডেন্ট লাইফ নিয়েই। দেশ থেকে পড়াশোনা করতে আসা স্টুডেন্টরা মায়ের গয়না, বাবার সঞ্চয়পত্র, পারিবারিক জমি, দোকান, কত কিছু বিক্রি করে কত স্বপ্ন নিয়ে এই দেশে পাড়ি জমিয়েছে! কতজন স্টুডেন্ট আসলে ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে? ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রায় নাগালের বাইরে থাকা টিউশন ফীস দিতে না পেরে এক কি দুই সেমিস্টার পর ওভারসীজ স্টুডেন্টগুলো ড্রপ আউট এর মাত্রা দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে, তাদের মধ্যে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্টুডেন্টরাই বেশি। ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রতি বছর তাদের ফীস বাড়িয়েই যাচ্ছে।

তবুও লিটন সাহেব স্বপ্ন দেখেন তিনি ইউনিভার্সিটি অব এসেক্সের কোর্সে আবার ভর্তি হবেন। থিয়েটার এর প্রতি মোহ তাঁর এখনও কাটেনি। প্রতি মাসে তিনি সেন্ট্রাল লন্ডন এর কোনও থিয়েটার হলে গিয়ে নাটক দেখে আসেন। শবনম এখনও ভাবে যে, আর একটু টাকা জমিয়ে আবার সে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলসে তার পদার্থবিদ্যার ডিগ্রীটা শেষ করবে। আসলাম প্রতি সেমিস্টারেই ভাবে এবার একটা ভাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সোহলে পড়াশোনার কথা এখন আর ভাবতেই পারে না। তার একটাই চিন্তা মায়ের গয়না আর বাবার সঞ্চয়পত্রের টাকা কীভাবে শোধ করা যায়! ইদানিং ভাবছে কোনও ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে কিনা। তাহলে ফুল টাইম কাজ করে টাকা কামাতে পারবে।

এই লন্ডন এই ছোট্ট একটা ঘরে একজন মানুষের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকীতে ৮/১০ জন মানুষের পার্টি শেষের এই দীর্ঘশ্বাস আসলে ব্রিটেনের বসবাসরত বেশির ভাগ বাংলাদেশি স্টুডেন্টের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী করা গেল না। সবাইকে বাসায় ফিরতে হবে। কাল থেকে যে আবার কাজ আছে। এত দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় কোথায়!